নির্জ্ঞান মন

পুষ্পা মিশ্র

'কোনো কৌতুকপ্রিয় শিশু-দেবতা দুষ্টামি করিয়া ঐ আতাগাছ দুটির মাঝখানে কেবল এক ফোঁটা মন ফেলিয়া দেয়, তবে ঐ সরল শ্যামল দারুজীবনের মধ্যে কী এক বিষম উপদ্রব বাধিয়া যায়। তবে চিন্তায় উহার চিকন সবুজ পাতাগুলি ভূর্জপত্রের মতো পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠে এবং গুঁড়ি হইতে প্রশাখা পর্যন্ত বৃদ্ধের ললাটের মতো কুঞ্চিত হইয়া আসে। তখন বসন্ত কালে আর কি অমন দুই-চারি দিনের মধ্যে সর্বাঙ্গ কচি-পাতায় পুলকিত হইয়া উঠে, বর্ষা শেষে ঐ গুটি আঁকা গোল গোল গুচ্ছ গুচ্ছ ফলে প্রত্যেক শাখা আর কি ভরিয়া যায়। তখন সমস্ত দিন এক পায়ে উপর দাঁড়াইয়া ভাবিতে থাকে, 'আমার কেবল কতগুলো পাতা হইল কেন, পাখা হইল না কেন? প্রাণপণে সিধা হইয়া এত উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া আছি, তবে কেন যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাইতেছি না? ...গেল বেচারার ফুল ফোটানো, রসশস্যপূর্ণ আতাফল পাকানো। যাহা আছে তাহা অপেক্ষী বেশী হইবার চেষ্টা করিয়া, যে রকম আছে আর এক রকম হইবার ইচ্ছা করিয়া, না হয় এদিক, না হয় ওদিক।' (মন, সংকলন, পৃ-৩৪৭, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

কেবলমাত্র এক ফোঁটা মনে যদি আতাগাছদুটির এরূপ দয়নীয় অবস্থা হয়, তাহলে মন যাদের সংজ্ঞাগত বৈশিষ্ট্য সেই মানুষের অবস্থার কথা বলাই বাহুল্য। তাও তো রবীন্দ্রনাথ শুধু চেতন মনের কথাই বলেছেন, অবচেতন বা নির্জ্ঞান মনের জটিলতার প্রশ্নই তোলেন নি। আমরা আজ এই প্রবন্ধে নির্জ্ঞান মন, তার বৈশিষ্ট্য এবং মানব-জীবনে তার গুরুত্বর কথা আলোচনা করবো। এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত পদগুলির বা পরিভাষা ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতির দ্বারা নির্জ্ঞান (unconscious mind) যেহেতু মনঃ সমীক্ষণ (Psychoanalysis) নামক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা ড. সিগমুণ্ডা ফ্রয়েডের (১৮৫৬-১৯৩৯) আবিষ্কার তাই নির্জ্ঞান মন সম্বন্ধে যে কোনো আলোচনায় মনঃ সমীক্ষণের আলোচনা অপরিহার্য। এই প্রবন্ধে আমরা যথাসম্ভব সংক্ষেপে ফ্রয়েড ও মনঃসমীক্ষণী তত্ত্বে প্রদত্ত নির্জ্ঞান মন ও তার কার্যাবলী আলোচনা করছি। এই আলোচনার পূর্বে একটি কথা স্পষ্ট করা প্রয়োজন। নির্জ্ঞান মনের আবিষ্কারকরূপে ফ্রয়েডের নাম সর্বাগ্রগন্য হলেও এ কথা বললে ভুল বলা হবে যে তাঁর পূর্বে নির্জ্ঞান মন সম্বন্ধে কেউ চিন্তা - ভাবনা করেন নি। দার্শনিক সোপেনহাওয়ার এবং নীৎসের লেখায় নির্জ্ঞান মনের উল্লেখ আছে। আর ফ্রয়েড নিজেও স্বীকার করেন যে তিনি এই দুই দার্শনিকের মতবাদ দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে ফ্রয়েডের সমসাময়িক পিয়ার জ্যানের (Pierre Janet, ১৮৫৯-১৯৪৭) অবদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তবে এ কথা ও স্বীকার করতে হয় যে নির্জ্ঞান মনের ধারণাকে এক সুস্পষ্ট রূপ প্রদান করে আমাদের মানসিক ক্রিয়া -কলাপ, অনুভূতি - আবেগ, চিন্তা - কল্পনা এবং সুস্থতা ও অসুস্থতার সঙ্গে কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত করে তার অস্তিত্ব তাত্ত্বিক ভাবে প্রতিষ্ঠা করার কাজ ফ্রয়েডই করেছেন। যে যুগে মনকে চেতনার সঙ্গে সমব্যাপক বলে গ্রহণ করা হত, সে যুগে এই তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠা যথেষ্ট দূরহ কাজ। দেকার্তের 'cogito ergo sum' -এর প্রভাব ঊনবিংশ শতাব্দীতেও বেশ প্রবল ছিল। সুতরাং নানান বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও গ্রন্থে ফ্রয়েড ক্রমাগত যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিলেন।

বিপরীতভাবে ফ্রয়েড প্রবর্তিত মনঃসমীক্ষণ নামক মনোবিজ্ঞানের শাখায় চেতনার পরিসর সীমিত। ফ্রয়েড বারে বারে বলেছেন যে আমাদের চেতনার ধারা নিরবচ্ছিন্ন নয়। সেখানে বহু ফাঁক আছে যেগুলি কেবল নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব স্বীকার করলেই ব্যাখ্যা করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, আমাকে কেউ বললেন, 'তোমাকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। কেন, কী ব্যাপার?' আমি উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ, আজ মনটা খারাপ লাগছে। জানি না কেন।' এই 'জানি না কেন' অঅমাদের চেতনার ধারায় এক বিচ্ছিন্নতা আনছে। হয়ত মনঃসমীক্ষণে ধীরে ধীরে পুরোনো হারিয়ে যাওয়া কোনো স্মৃতি ভেসে উঠল। আমার মনে পড়ল— আজ আমার বহু পুরোনো স্কুলের বন্ধু বাস-দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিল। ক'দিন আগেই তার কথা বলা হচ্ছিল। এই তথ্যটি আমাদের সচেতন মন বা সংজ্ঞানে ছিল না। নির্জ্ঞান মনে থেকে স্মৃতিটি অনেক চেষ্টার পরে উঠে এল এবং চেতনার ধারায় যে বিচ্ছিন্নতা ছিল, তা পূর্ণ করল। এরকম আনেক বহু দৈনন্দিন জীবনের ছোট - খাট ঘটনা, যেমন কোনো কোনো নাম ভুলে যাওয়া, কোনো বিশেষ বস্তু কোথায় রেখেছি ভুলে যাওয়া, কোন বিশেষ কাজ করতে ভুলে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনাগুলিকে আমরা কারণবিহীন বলেই ধরে নিই। কিন্তু ফ্রয়েডের মতে বহির্বিশ্বের ঘটনার মতো, আমাদের মানসিক জগতে কোনো ঘটনাই কারণবিহীন নয়। তবে, বহু ক্ষেত্রে কারণটি আমাদের সংজ্ঞান মনে থাকে না, থাকে নির্জ্ঞান মনে। সেখান থেকে কারণটিকে উদ্ধার করে আনলে চেতনার এই শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করা সম্ভব।

১৮৯৩ - ১৮৯৫ সালে ড. জোসেফ ব্রয়ার (Josef Breuer)-র এর সঙ্গে প্রকাশিত ফ্রয়েডের গ্রন্থ 'Studies of Hysteria' প্রথমবার তিনি অবদমন বা repression এর কথা বলেন। অবদমন বা repression এর অর্থ হল কিছু স্মৃতিকে চেতনার স্তর থেকে সরিয়ে দেওয়া। সেই স্মৃতি যখন ফিরে আসে তখন ভাবতে হয়, এই অন্তবর্তীকালে তা কোথায় ছিল। এখান থেকে নির্জ্ঞান মনের ধারণার সূত্রপাত। পরবর্তীকালে তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ 'Interpretation of dreams' (১৯০০), 'Psychopathology of Everyday Life' (১৯০৪), 'Jokes and Their Relation to the Unconscious' (১৯০৫) ইত্যাদি গ্রন্থে তিনি নির্জ্ঞান-মন, তার কর্মপদ্ধতি এবং আমাদের দৈনন্দিন এবং সামাজিক

জীবনে তার প্রকাশের কয়েকটি ধরন নিয়ে আলোচনা করেছেন। ১৯১৫ সালে 'On metapsychology' গ্রন্থে 'The Unconscious' নামে ছয়টি প্রবন্ধের সমষ্টিতে তিনি নির্জ্ঞানমন সম্বন্ধে তাঁর মতামত তুলে ধরেছেন।

নিজ্ঞান মন সম্বন্ধে তাঁর তত্ত্ব আলোচনা করার পূর্বে আমরা দু'টি বিষয় নিয়ে বলতে চাই। প্রথম, ফ্রয়েড নিউটনের দ্বারা অত্যধিক প্রভাবিত ছিলেন এবং পদার্থবিদ্যার নিয়ন্ত্রণবাদ তিনি মানসিক জগতের ঘটনাবলীর প্রতিও প্রযুক্ত হলে বিশ্বাস করতেন। তাঁর, তাঁর মানঃসমীক্ষণ তত্ত্বের মূল নীতি হল মানসিক নিয়ন্ত্রণবাদ নীতি (Principle of Psychic Determinism), অর্থাৎ কোনো মানসিক ঘটনা কারণ ছাড়া ঘটে না। নির্জ্ঞান মনের প্রয়োজন এখানেই। কারণটি যদি সচেতন মনে না থাকে, তাহলে তা নির্জ্ঞান মনে আছে। দ্বিতীয়, ফ্রয়েড যে নির্জ্ঞান মনের কথা বলেছেন তা কোনো তাত্ত্বিক বস্তু নয়, তা গতীয় বা dynamic, অর্থাৎ তা আমাদের সচেতন বা সংজ্ঞান মনের ক্রিয়া - কলাপ, এমন কি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ করে অথবা তার উপর প্রভাব বিস্তার করে। নির্জ্ঞান মনের এই গতীয় স্বরূপ (dynamic nature) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই গতীয় স্বরূপের জন্য নির্জ্ঞান মন আমাদের মানসিক রোগ-লক্ষণেরও নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, আবার আমাদের সচেতন ক্রিয়া-কলাপের উপরও প্রবাব বিস্তার করছে।

১৯১৫ সালে ফ্রয়েড তাঁর The Unconscious' প্রবন্ধে নির্জ্ঞান মন সম্বন্ধে যে তত্ত্বটি প্রণয়ন করেন তা সংস্থানগত তত্ত্ব বা Topographical Theory of Mind নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে ১৯২৩ সালে তিনি এই তত্ত্বে কিছুটা পরিবর্তন আনেন এবং নতুন একটি তত্ত্বে প্রতিষ্ঠা করেন। নতুন এই তত্ত্বটির নাম গঠনমূলক তত্ত্ব বা Structural Theory o Mind। এই তত্ত্বে তিনি তাঁর পূর্বের তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সবই বজায় রেখেছিলেন কিন্তু নতুন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংযোজিত করেছিলেন। আমরা নিম্ন সেই তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি।

ফ্রয়েড মনকে 'mental apparatus' অভিধার দ্বারা সম্বোধিত করেছেন। এই mental apparatus বা মানসিক যন্ত্রের গঠনই তিনি তাঁর গঠনমূলক তত্বে বর্ণনা করেছেন। আমাদের মানসিক যন্ত্র তিনটি ক্রিয়াত্মক entity-র দ্বারা গঠিত; অসদ (Id), অহম (Ego) এবং অধিশাস্ত (Super ego)। অসদ বা Id: যা কিছু আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি, যা কিছু আমাদের মধ্যে জন্ম থেকে উপস্থিত, যেমন, আমাদের প্রবৃত্তি, আমাদের ব্যক্তিত্বের কাঠামো— সবগুলির আধার এই অসদ। 'Id' শব্দটি একটি ল্যাটিন শব্দ, এর অর্থ হল 'It'। শব্দটির অর্থের মাধ্যমেই অদসের নিরপেক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক চরিত্র প্রকাশ পাচ্ছে। শিশু যখন জন্মায় তখন সে শুধু অসদ অর্থাৎ শিশুর মন প্রবৃত্তি সর্বস্ব বলেই ফ্রয়েড মনে করেন। শিশু প্রবৃত্তি তাড়িত এবং প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ না হলে যে তাদেনর (tension) সৃষ্টি হয়, তার মোক্ষণই শিশুর একমাত্র লক্ষ্য। এই প্রবৃত্তিই আমাদের মানসিক ক্রিয়াশক্তি (mental energy)-র উৎস।

অসদের দু'টি অংশ আছে, একটি হল আমাদের প্রবৃত্তির আধার, দ্বিতীয়টি আমাদের অবদমিত কামনা-বাসনায় বাসস্থল। ফ্রয়েড দ্বিতীয় অংশের বিশেষ একটি নাম দিয়েছেন —The Repressed. ফ্রয়েডের মতে আমরা দু'রকমের প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করি। একটি হল Eros বা কামপ্রবৃত্তি, অপরটি Thanatos বা ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি। প্রথমটির কাজ সদর্থক — এটি ভালোবাসার প্রবৃত্তি, সংযোগ ও যোজনার মূলে এই প্রবৃই Eros রয়েছে। এরই প্রভাবে আমরা পরস্পরকে ভা—অবাসি, পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করি, সুসংবন্ধ হই, গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে দেশ এবং দেশ থেকে বিশ্ব সম্প্রদায় গড়ার স্বপ্ন দেখি। মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য Eros অপরিহার্য। Eros এর ক্রিয়াশক্তির নামই লিবিডো (libido)। শিশুর জন্ম থেকেই লিবিডো তার মধ্যে উপস্থিত থাকে এবং শিশুর দৈহিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে লিবিডোও পরিণতির কয়েকটি স্তর পার হয়ে পরিপূর্ণতায় উপনীত হয়। যেমন, মুখকাম, পায়ুকাম, শিশ্নস্তর, ঈডিপাস স্তর অতিক্রম করে পরিশেষে হৈঙ্গিক স্তরে অতিক্রম করে পরিশেষ লৈঙ্গিক স্তরে এসে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

Thanatos হল আমাদের আক্রমবৃত্তি। আমরা যেমন Eros এর মাধ্যমে সৃষ্টি করি Thanatos এর মাধ্যমে ধ্বংস করি। ফ্রয়েডের মতে আমাদের প্রত্যেক কাজে Eros ও Thanatos ভিন্ন-ভিন্ন মাত্রায় উপস্থিত থাকে। কোনটির মাত্রা বেশি তার উপরেই কাজটি সৃষ্টিমূলক না ধ্বংসমূলক— তা নির্ভর করে। পরবর্তীকালের মনঃসমীক্ষকরা মনে করেন যে Thanatos এর নিজস্ব কোনো সুখ পাবার ব্যাপার নেই। থ্যানাটোস প্রতিক্রিয়ারূপে ক্রিয়াশীল হয় অর্থাৎ Eros সেখানে বাধাপ্রাপ্ত হয়, আমাদের ইচ্ছাপূরণে যেখানে বাধার সৃষ্টি হয়, থ্যানাটোস সেখানে ধ্বংসাত্মক ক্রিযার মাধ্যমে বা অপসারিত করে।

The Repressed বা নির্জ্ঞান মনের যে অংশে আমাদের অবদমিত কামনা - বাসনা থাকে সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অবদিত কামনা-বাসনা আমাদের সচেতন মন থেকে নির্বাসিত হয়েছে কেন না এগুলি আমাদের সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। এই নির্বাসন কিন্তু তাদের ক্রিয়াশক্তি ছিনিয়ে নেয় নি। অবদমিত এই কামনা - বাসনা নির্জ্ঞান মনেও ক্রিয়াশীল থাকে এবং তাদের নিরন্তর প্রয়াস হল নিজ্ঞান স্তর পার হয়ে, সংজ্ঞান বা সচেতন মনের স্তরে প্রবেশ করে সন্তুষ্টি লাভ করা। সাধারণভাবে নির্জ্ঞান মনের উপাদানের সংজ্ঞান মনে প্রবেশ নিষিদ্ধ। তার হয় সংজ্ঞান মনে প্রবেশই করতে পারে না, অথবা অনেক বাধা অধিক্রম করে অনেক প্রচেষ্টার পরই নির্জ্ঞানের বিষয়বস্তু সংজ্ঞান স্তরে প্রবেশাধিকার পায়। নির্জ্ঞান মনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে, তার কয়েকটি আমরা নিম্নে বর্ণনা করছি।

নির্জ্ঞান মনের বৈশিষ্ট্য : নির্জ্ঞান মনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল সংজ্ঞান মনের সঙ্গে এর যোগাযোগের অভাব। নির্জ্ঞান মনের বিষয়বস্তুকে সংজ্ঞান স্তরে প্রবেশ করতে হলে এই দুই স্তরের মাঝামাঝি আরো একটি মননের স্তর অর্থাৎ আসংজ্ঞান বা Preconscious স্তর পার হতে হবে। নির্জ্ঞান ও আসংজ্ঞানের মাঝে প্রহরীরূপে একটি সেন্সারের (censor) অবস্থান আছে। এই প্রহরী হল আমাদের নৈতিক বা সামাজিক মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধ প্রবলভাবে আমাদের অবদমিত ইচ্ছাগুলিকে বাধা দেয়। কিন্তু কোনোক্রমে যদি এই ইচ্ছাগুলি আসংজ্ঞান স্তরে উঠে আসে, তাহলে আসংজ্ঞান আর সংজ্ঞান স্তরের মাঝে আরো একটি সেন্সার বা প্রহরী তাদের বাধা দেয়। মূল কথা হল, আমরা অবদমিত ইচ্ছাগুলিকে অবদমিত করেই রাখতে চাই এবং তারা যাতে মনের সচেতন স্তরে এসে আমাদের ব্যক্তিত্বের সংহতি (integrity) নষ্ট না করতে পারে, তার জন্য আমরা বা আমাদের অহম্ সর্বদা সচেষ্টা থাকে।

নির্জ্ঞান মনের উপাদানগুলি প্রাথমিক প্রক্রিয়া বা primary process এর দ্বারা চালিত। প্রাথমিক প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য হল মানসিক ক্রিয়াশক্তির তাৎক্ষণিক মোক্ষণ অর্থাৎ ইচ্ছে হলেই সেটা পূর্ণ করে পরিতৃপ্ত ইচ্ছার ফলে যে তান বা tension এর সৃষ্টি হয়, তার থেকে মুক্তি লাভ করা। আমরা এর প্রকৃষ্ট প্রকাশ শিশুদের মধ্যে দেখতে পাই। শিশুর প্রবৃত্তিগত চাহিদা তাৎক্ষণিক পূর্ণতার দাবী করে, কোনো বাধা বা বিলম্ব প্রবৃত্তিগত চাহিদা তাৎক্ষণিক পূর্ণতার দাবী করে, কোনো বাধা বা বিলম্ব মানতে চায় না। এছাড়া প্রাথমিক প্রক্রিয়ার আরো দু'টি বৈশিষ্ট্য হল, এই হচ্ছাশক্তিগুলি অতি সহজে স্থানান্তরিত করা যায়। শিশু দুধের বোতল পেল না, সে তৎক্ষণাৎ তার আঙুল চুষতে শুরু করলো। এগুলি আবার সংক্ষেপণ (condensation) করাও সহজ। অর্থাৎ একটি ইচ্ছাকে বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, তার মধ্যে আরো কয়েকটি ইচ্ছা লুকিয়ে ছিল এবং একটি ইচ্ছার তৃপ্তির মাধ্যমে আরো কয়েকটি ইচ্ছা অন্ততঃ আংশিক তৃপ্তি লাভ করেছে।

নির্জ্ঞান মনে কোনো স্ববিরোধিতা নেই। পরস্পরবিরোধী ইচ্ছে বেশ পাশাপাশি বাস করতে পারে। যদি দু'টি ইচ্ছেই একসঙ্গে তৃপ্ত হবার চেষ্টা করে, তাহলে একটি যে অপরটিকে বতিল করে দেয়, তা নয়, বরং একটি অপরটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে অর্থাৎ দুটিই আংশিক তৃপ্তি লাভ করে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আমি আমার সন্তানকে ভালোবাসি, আবার নানান কারণে সন্তানের প্রতি আমার ক্রোধ বা প্রবল রাগও আছে। কিন্তু আমি মা হয়ে কী করে সন্তানের উপর রাগ করতে পারি। তাই, সেই রাগ বা আক্রোশ আমি অবদমিত করি। দেখা গেল, আমি সন্তানের প্রতি অত্যন্ত সতর্ক, সতর্কতার জন্য তাকে নানা বাধা-নিষেধের গণ্ডীতে আটকে রেখেছি। এর ফলে আমার দুটিজ ইচ্ছেই আংশিক তৃপ্তি পাচ্ছে তার মাধ্যমে সন্তানের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে তাকে কষ্টও দিচ্ছি।

নির্জ্ঞান মনে 'না' বা negation এর বোধ নেই। নির্জ্ঞান মনে শুধু প্রবৃত্তির বাস এবং নির্জ্ঞান মন সুখ সূত্র বা pleasureprinciple এর দ্বারা চালিত। সুখ-সূত্রের নীতি হয় সুখ পাওয়া এবং অ-সুখ বা যন্ত্রণা এড়িয়ে যাওয়া। সুতরাং নির্জ্ঞান মন শুধু চাহিদা তৃপ্তির মাধ্যমে সুখের সন্ধানই করে। 'না' বা negation এর ধারণা বাস্তব বোধের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং অদসে কোনো বাস্তববোধ নেই।

অনুরূপভাবে, নির্জ্ঞান মনে কোনো সময়ের বোধও নেই। এখানকার বিষয়বস্তু সময়ের দ্বারা পরিবর্তিত হয় না। অতি শৈশবে অবদমিত ইচ্ছেগুলো ঐ একই রূপে আমাদের মনে বিরাজ করে। তাদের পরিবর্তন ঘটানোর জন্য সচেতন মনে এনে পরিণত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তাদের নতুন ভাবে দেখতে হবে। পরিণত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শৈশবের ইচ্ছা, কামনার নবমূল্যায়ন আমাদের বহু মানসিক রোগ-লক্ষণ ও অবাঞ্ছিত চারিত্রিক প্রলক্ষণ থেকে মুক্তি দিতে পারে। এই দুরূহ কাজই মনঃসমীক্ষণী চিকিৎসার মাধ্যমে করা হয়ে থাকে।

নির্জ্ঞান মনের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এখানে আমাদের ইচ্ছেগুলির কোনো ভাষাগতরূপ নেই। ভাষা বা verbal image হল আসংজ্ঞান মনের বৈশিষ্ট্য। নির্জ্ঞান মনে ভাষার অভাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মানসিক রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে অবদমিত বাসনা - কামনা বা বিস্মৃত যখন সংজ্ঞান স্তরে উঠে এসেছে এবং তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে, তখন রোগ-লক্ষণও দূরীভূত হয়েছে অথবা তার তীব্রতা অনেকাংশে লাঘব হয়েছে। বর্তমান লেখকের এক রোগিনী অত্যন্ত রক্ষণশীল পরিবেশে বড় হয়েছিলেন। প্রবল উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, আর মাথায় চাপ অনুভব করতেন। চিকিৎসার মাধ্যমে একটু সহজ হয়ে তিনি 'sex' কথাটা উচ্চারণ করতে পারলেন এবং বললেন, এটুকু বলতে পেরেই তিনি অনেক স্বস্তি লাভ করেছেন। ভাষার এই অভাব আরো একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। ভাষা যেখানে নেই, সেখানে আমরা চাক্ষুষ প্রতিমূর্তির মাধ্যমে চিন্তা করি। এই চিন্তা পদ্ধতি অত্যন্ত আদিম এবং শিশুকালীন চিন্তা পদ্ধতি। নির্জ্ঞান মনের আদিম এবং শিশুসুলভ স্বরূপ এটার মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। আমাদের স্বপ্নে আমরা এইরূপ প্রত্যাবৃত্তিমূলক (regressive) পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করি। তাই স্বপ্নও আমরা বেশীর ভাগ চাক্ষুষ প্রতিমূর্তি (visual image) এর মাধ্যমে দেখি। ভাষার ব্যবহার সেখানে অত্যন্ত কম।

প্রাথমিক মানসিক প্রক্রিয়াকে প্রাথমিক এই কারণে বলা হচ্ছে যে তারা শিশুর বিকাশের প্রথম স্তরে ক্রিয়াশীল। ছোট শিশু প্রাথমিক মানসিক ক্রিয়ার দ্বারাই চালিত। শিশুর বিকাশের সাথে সাথে প্রাথমিক মানসিক প্রক্রিয়া, গৌণ বা অপ্রধান মানসিক প্রক্রিয়ার (secondary process) দ্বারা স্থানান্তরিত হয়। অপ্রধান মানসিক প্রক্রিয়া বাস্তববোধের

সূত্র (reality principle) এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পূর্ণবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে অপ্রধান মানসিক প্রক্রিয়াই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।

ফ্রয়েড বলেছেন : 'To sum up, exemption from mental contradiction, primary process (mobility of catheses), timelessness, replacement of external by interual reality - these are the characteistics which we way expect to fine in processes belonging to the system ucs.' (The unconscious - 'On metapsychology', S. freud, Penguin Library)

উপরের আলোচনায় একটি ছবি আমাদের সামনে ফুটে উঠছে। নির্জ্ঞান মনের উপাদান অহরহ সংজ্ঞান মনে আসতে সচেষ্ট এবং সংজ্ঞান মন তাদের বাধাদানে নিরন্তর প্রয়াসী। যদি কোনো কারণে (যেমন, বহির্জগতের কোনো উদ্দীপকের দ্বারা উদ্দীপিত হয়) নির্জ্ঞান মনের উপাদান অতিরিক্ত প্রবল হয়ে সেন্সারশিপের বাধা অতিক্রম করে আমাদের সংজ্ঞান মনে প্রবেশ করে তখন অহম প্রথমে উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে (anxiety) মনকে সতর্ক করার চেষ্টা করে। আমরা যদি অকারণে খুব উৎকণ্ঠা অনুভব করি, তাহলে বুঝতে হবে আমাদের কোনো অবদমিত কামনা প্রবল হয়ে প্রহরীর বাধা এড়িয়ে আমাদের সচেতন মনের কাছাকাছি এসে পড়েছে।

এই উৎকণ্ঠা কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদ্‌বায়ু, রোগের (neurosis) এবং অতিরিক্ত প্রবল হলে বাতুলতার (Psyhosis) সৃষ্টি করতে পারে। অর্থাৎ এই সেন্সারশিপ বা প্রহরীই আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করে। যদি কোনো কারণে প্রহরী ঐ অবদমিত ইচ্ছাগুলির সংজ্ঞানে প্রবেশ নিরোধে সক্ষম না-হয়, তখনই অহম রোগ-লক্ষণ সৃষ্টি করে কোনোভবে নিজের সংহতি বজায় রাখতে চেষ্টা করে। সেকানে অক্ষণ হলে একেবারেই ভেঙে পড়ে এবং আমরা মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি।

কয়কটি বিশেষ উপায়ের মাধ্যমে নির্জ্ঞান মনের উপাদানগুলি মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি না করে সজ্ঞান স্তরে প্রবেশ করে আংশিক তৃপ্তি লাভ করতে পারে। এই উপায়গুলি হল স্বপ্ন, হাস্য - কৌতুক, আমাদের দৈনন্দিন ভুল-ভ্রান্তি ইত্যাদি। ফ্রয়েড মনে করেন, স্বপ্নের মাধ্যমে আমাদের অবদমিত ইচ্ছাগুলির এক ধরনের কাল্পনিক পূর্তি ঘটে (hallucinatory wish fulfillment) এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত মানসিক ক্রিয়াশক্তির মোক্ষণ ঘটে (discharge of psychic energy)। এই মোক্ষণ আমাদের মানসিক সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

হাস্য - কোতুক (jokes) এর মাধ্যমেও আমরা এই কাজ সম্পাদন করতে পারি। ফ্রয়েডেরই প্রদত্ত দু-একটি উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত করছি : একজন চিকিৎসক রোগিনীকে পরীক্ষা করে ঘরের বাইরে এলেন। রোগিনীর স্বামী তাঁকে অনুসরণ করলেন। চিকিৎসক বললেন — 'ওঁর চেহারাটা আমার ভালো লাগল না।' স্বামীটি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, 'আমার অনেক দিন থেকেই ওঁর চেহারা ভালো লাগছে না।' (wit & its Relation to the Unconscious basic writing of Sigmund freud, Tr. by A. A. brill, page 151).

স্পষ্টতই, চিকিৎসকের বক্তব্য রোগিনীর অবস্থার সঙ্গে যুক্ত কিন্তু তাঁর ভাষা স্বামীটিকে তাঁর স্ত্রীর প্রতি বিরাগ প্রকাশের একটা সুযোগ করে দিল। অনুরূপভাবে হাস্য - কৌতুকের মাধ্যমে আমরা অন্যেদের প্রতি আমাদের রাগ, ক্রোধ বা অন্যান্য অসামাজিক মনোভাব যা আমরা সচেতনভাবে স্বীকার করি না, তা প্রকাশ করতে পারি। সমাজও এই ধরনের স্বাধীনতা স্বীকার করে আমাদের অবদমিত ইচ্ছাগুলিকে প্রকাশের সুযোগ দিচ্ছে। প্রাচীন কলের রাজার দরবারে বিদূষক থাকতেন। তিনি ঠাট্টা, তামাশার মধ্য দিয়ে অনেক কটু সত্য রাজসমক্ষে তুলে ধরতেন। ব্যাঙ্গাত্মক সাহিত্যরচনা, প্রহসন এবং ঐ শ্রেণির নাটক, সিনেমা ইত্যাদিও এই একই উদ্দেশ্য সাধিত করেছে।

দৈনন্দিন ভুল-ভ্রান্তির (parapraxes) মাধ্যমেও আমরা আমাদের অবদমিত ইচ্ছেগুলি প্রকাশ করি যদিও এ সম্বন্ধে আমরা সচেতন থাকি না। ফ্রয়েডের 'Psychopathology of Everyday Life' থেকে একটি ছোট উদাহরণ উদ্ধৃত করছি।

'একজন রোগিনী চিকিৎসার ব্যয়ে যথেষ্ট ভারাক্রান্ত ছিলেন। ফ্রয়েড যখন তাঁর প্রেসক্রিপশান লিখছিলেন, তিনি বলে উঠলেন, 'দয়া করে আমায় বড় বিল দেবেন না, আমি গিলতে পারি না।' তিনি বলতে চেয়েছিলেন, 'আমায় বড় পিল দেবেন না' কিন্তু চিকিৎসার ব্যয় নিয়ে তাঁর যে দুর্ভাবনা ছিল, তা বাচিক এই ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

যে মহিলা তাঁর বিবাহ নিয়ে অসন্তুষ্ট, তিনি বিয়ের আংটি হারিয়ে ফেললেন, যে প্রেমিকা প্রেমিকার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে না, সে প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করার সময় ভুলে গেল অথবা ক্রমাগত অনেক দেরীতে পৌঁছলো, যে স্বামী, স্ত্রী কোনো বিশেষ নিমন্ত্রণ রক্ষা করুন চান না, তিনি স্ত্রীকে নিমন্ত্রণ বাড়ি নিয়ে যাবার সময় হঠাৎ গাড়ির চাবি খুঁজে পেলেন না — এ ধরনের ঘটনাগুলির মাধ্যমে যা আমরা সচেতনভাবে স্বীকার করতে চাই না, তা-ই প্রকাশিত হয়ে মনের ভার বা চাপ কমিয়ে দেয়, যদিও আমরা সে সম্বন্ধে সচেতন থাকি না।

এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, আমি যদি ইচ্ছা - পূরণের সুখই না ভোগ করতে পারলাম, যদি বুঝতেই না পারলাম যে আমার ইচ্ছার পূর্তি ঘটেছে, তাহলে সেই ইচ্ছাপূরণের লাভ কী? এর উত্তরে বলা যায়, প্রতিটি ইচ্ছার সঙ্গে প্রবৃত্তিজাত কিছু মানসিক ক্রিয়াশক্তি (energy) যুক্ত থাকে। ঐ ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ ঘটলে মানসিক চাপ লাঘব

হয়। প্রবৃত্তির স্বভাব হচ্ছে, চাপের কোক্ষণ। এই কোক্ষণের ফলে আমাদের মানসিক স্থিতাবস্থা বজায় থাকে কারণ আমাদের মন সব সময় সর্বাপেক্ষা কম চাপের অবস্থায় থাকার নীতির দ্বারা পরিচালিত।

দ্বিতীয় আরো একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই ব্যাখ্যাটি সত্য কি-না। এই ধরনের অনেকগুলি ঘটনা পরে মনঃসমীক্ষণের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং যে সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হয়েছি, তা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

আমাদের এতক্ষণের আলোচনায় মনে হতে পারে যে অদস স্বেচ্ছাচারী একতন্ত্রনায়কের মধ্যে আমাদের মানসিক সংহতি যে কোনো মুহূর্তে উল্টে-পাল্টে দিতে পারে। কথাটি সর্বৈব সত্য নয়। নির্জ্ঞান মনের উপাদান প্রবল শক্তিশালী হলেও আমাদের মানসিক যন্ত্রে অন্য একটি কর্মকর্তা বা agent আছে যে নির্জ্ঞান মনকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই এজেন্টের নাম অহম।

বর্তমানে Ego Psychologist -রা মনে করেন যে শিশু যেমন অসদ নিয়ে জন্মায়, তেমনি সে অহম নিয়েও জন্মায়। জন্মের সময় অসদের প্রাধান্য থাকলেও শিশুর ক্রমবিকাশের সঙ্গে অহমের বিকাশও ঘটে। অহম বাস্তব সূত্র বা reality principle-এর দ্বারা চালিত। তার মুখ্য কাজ হচ্ছে আত্মরক্ষা (self-preservation)। এই আত্মরক্ষার কাজে তাকে দু'দিকের উদ্দীপক সামলাতে হয় — বহির্জগতের ও অন্তর্জগতের। বহির্জগতের উদ্দীপক অহম ভিন্ন - ভিন্ন পন্থায় নিয়ন্ত্রণ করে। অত্যধিক উদ্দীপকের ক্ষেত্রে পালিয়ে গিয়ে আর সীমিত উদ্দীপকের সঙ্গে অভিযোজন (adaptation) করে। উদ্দীপকের স্মৃতি সংরক্ষণ করে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্দ্ধারণের মাধ্যমে সে বাইরের জগতের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে। এই দুরূহ কাজ সম্পাদনের জন্য অহম তার পঞ্চ ইন্দ্রিয়, চৈষ্টিক পেশী সমূহ, বুদ্ধি, স্মৃতি ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। অহমের চেতনা প্রত্যক্ষের পরিধি অত্যন্ত সঙ্কুচিত। এই মুহূর্তে যা প্রত্যক্ষ করছি, পর মুহূর্তে তা আর চেতনার স্তরে থাকছে না। তার স্মৃতিরূপে আমাদের আসংজ্ঞান (preconscious) স্তরে সংরক্ষিত হচ্ছে। আসংজ্ঞান স্তরের উপাদান অহম ইচ্ছা করলেই চেতন স্তরে আনতে পারে; যেমন কাল আমি প্রাতরাশে কী খেয়েছিলাম তা আমার তাৎক্ষণিক চেতনায় নেই, কিন্তু আমি একটু চেষ্টা করলেই তা চেতন স্তরে নিয়ে আসতে পারি। অর্ন্তজগতের ক্ষেত্রে অহম আমাদের প্রবৃত্তিগুলো তাড়না নিয়ন্ত্রণ করে নিজের সংহতি বজায় রাখে। বহি'জগতের পরিস্থিতি বিবেচনা করে অহম নির্দ্ধারিত করে অদসের কোন ইচ্ছা পূরণ করা হবে, কোনটার সন্তুষ্টি বিলম্বিত করা হবে, আর কোনটা আদৌ পূরণ করা হবে না। অপূর্ণ ইচ্ছার ক্রিয়াশক্তি যখন অদসের সীমানা ছাড়িয়ে অহমের সীমানায় প্রবেশ করতে চায় (অর্থাৎ নির্জ্ঞান মনের স্তর ছাড়িয়ে সংজ্ঞান স্তরে প্রবেশ করার মতো অবস্থায় আসে) তখন অহম উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠাকে সতর্কতার ইঙ্গিতরূপে প্রেরণ করে (anxiety as dangr singal) কেননা নির্জ্ঞান মনের সংজ্ঞান মনে প্রবেশ অহমের সংহতি ক্ষুণ্ণ করতে পারে, তাই এরূপ পরিস্থিতি অহমের কাছে উদ্বেগজনক। অহম সর্বাগ্রে অবদমিত ইচ্ছাগুলিকে পুনরায় অবদমিত করে নির্জ্ঞান মনে পাঠাবার চেষ্টা করে। কিন্তু ইচ্ছাগুলির শক্তি যদি প্রবল হয় এবং অবদমনের মাধ্যমে যদি তাদের প্রতিরোধ করা সম্ভব না হয় তবে অহম নানারকমে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কতকগুলি মুখ্য প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা (defence mechanism) হল: অবদমন (repression), অধ্যারোপ (projection), একাত্মীকরণ (identification), উদ্‌গতি (sublination), স্থানান্তরকরণ (Dispacement), অস্বীকার, (denial), একাকীকরণ (isolation), প্রতিক্রিয়া ফল (reaction formation), গুটিয়ে যাওয়া (withdrawal), আত্মীকরণ করা হয়, কোনটির মাধ্যমে তার বস্তু পরিবর্তিত করা হয়, আবার কোনটির মাধ্যমে দুই-ই করা হয়। যে মহিলার সন্তানের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ, হয়নি, তিনি হয়তো জীব-জন্তুর লালন - পালন করছে সুখ পাচ্ছেন, অথবা অনাথ শিশুর দেখা - শোনার দায়িত্ব নিচ্ছেন। প্রথম ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির বস্তু পরিবর্তিত হয়েছে। নিজের সন্তানের পরিবর্তে জীবজন্তুর বিকাশ, লালন - পালনের মাধ্যমে তাঁর মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হচ্ছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি বস্তু পরিবর্তিত হয়েছে এবং একটি উদ্‌গতি বা sublimation ও ঘটেছে। অর্থাৎ তিনি সমাজে স্বীকৃত এমন কাজ করছেন যার লক্ষ্য শুধুমাত্র নিজের প্রবৃত্তির তৃপ্তিতে আবদ্ধ নয়, তা তার অহমের সীমানা অতিক্রান্ত করে অহমকেও প্রসারিত করেছে। উদ্‌গতি ও স্থানান্তকরণ সফল প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, অন্যান্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অসফল (unsuccessful) প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার পর্যায়ে পড়ে। এই ব্যবস্থাগুলি প্রায়ই মানসিক রোগ-লক্ষণের জন্ম দেয়। প্রতিরোধমূলক সব ব্যবস্থা ভেঙে গেলে অহমের সংহতি বিনষ্ট হয় আর অহম বাতুলতা রোগে (psychosis) আক্রান্ত হয়। এই সবক্ষেত্রে অর্ন্তজগতের প্রবৃত্তির তাড়না নিয়ন্ত্রণ করতে অহম ব্যর্থ হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। অহমই এই সব প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে কিন্তু অচেতনভাবে। অর্থাৎ অহমের কাজ চেতন ও অচেতন, সংজ্ঞান ও নির্জ্ঞান — দুই স্তরেই চলে। অসদ যেমন সুখ-নীতির দ্বারা চালিত অহম তেমনি বাস্তব - নীতি (Reality Principle) -এর দ্বারা চালিত। অসদ প্রাথমিক প্রকিয়ার দ্বারা চালিত, অহম গৌন প্রক্রিয়া (Secondary Process)। তাই অহম তাৎক্ষণিক তৃপ্তির পেছনে ছোটে না। তার চিন্তা পদ্ধতিও যুক্তিসঙ্গত। তাই সচেতনভাবে আমরা স্ববিরোধী চিন্তা করি না। বাস্তব পরিস্থিতি চিন্তা করি না। বাস্তব পরিস্থিতি বুঝে, যুক্তিসঙ্গত ভাবে চিন্তা করে অহম অদসের কামনা-বাসনা পূরণের চেষ্টা করে।

অধিশাস্তা — বাস্তবের সঙ্গে সংস্পর্শে আসা অহমের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমরা আগেই বলেছি, অহম এই কাজ তার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করে। বাস্তবের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেন বিশ্বর পিতা, মাতা বা

পিতৃ-মাতৃস্থানীয় যাঁরা তার যত্ন নেন। পিতা, মাতাই শিশুর জীবন রক্ষা ও তার সামাজিকীকরণ (socialization) এর মূল দায়িত্ব বহন করেন। তাঁদের আচার - আচরণ, মূল্যবোধ শিশুর কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রক্রিয়ায় শিশু পিতা মাতার শাসন ও তাদের মূল্যবোধ অন্তঃক্ষেপ বা introject করে। অন্তঃক্ষেপণ এমন একটি প্রক্রিয়া যার ফলে বহির্জগতের বস্তু অহমের ব্যক্তিত্বের অংশ হয়ে যায়। এই অন্তঃক্ষেপণের মাধ্যমে পিতা - মাতার অনুশাসন শিশুর কাছে আর বাইরের অনুশাসন থকে না, তার নিজের অন্তরের অংশ হয়ে যায় এবং তার ভবিষ্যৎ নৈতিক বোধ নির্ধারিত করে। এই নৈতিক বোধ অহমেরই একটি অংশ কিন্তু তার থেকে পৃথক। একে মনঃসমীক্ষণের ভাষায় অধিশাস্ত (super ego) বলা হয়। সাধারণ ভাষায় একে আমরা বিবেক বলি।

ফ্রয়েডের মতে বিবেকের দুটি অংশ আছে — স্বাদর্শ (Ego ideal) আর নিশ্চিত আদেশ (The categorical imperative)। প্রথমটি অহম যা হতে চায় তারই প্রতিনিধিত্ব করে। আমি যদি কোনো কাজে বা কোনোক্ষেত্রে আমার স্বাদর্শের মানদণ্ড স্পর্শ না করতে পারি, তাহলে আমার মধ্যে হীনতার বোধ জন্মায়, আমি নিজের কাছে নিজেই ছোট হয়ে যাই। যে আদর্শ আমি নিজের কাছে, নিজের জন্য ঠিক করে রেখেছি, সেখানে পৌঁছাতে না-পারা আমার মনে অক্ষমতার গ্লানির জন্ম দেয়।

নিশ্চিত আদেশ বা categorical imprative অধিশাস্তার নির্বিচার, যুক্তিহীন নৈতিক দাবীর প্রতিনিধিত্ব করে। শিশু যখন পিতা-মাতার নৈতিক মূল্যবোধ অন্তঃক্ষেপ করে, তখন তার বিচারশক্তি অত্যন্ত অপরিণত থাকে। তাই পিতা, মাতা বা গুরুজন স্থানীয় ব্যক্তিদের বক্তব্য ও আচার - আচরণ সে নির্বিচারে গ্রহণ করে এবং অন্তঃক্ষেপের মাধ্যমে তা তার ব্যক্তিত্বের অংশ হয়ে যায়। পিতা-মাতার ব্যবহারে অনেক যুক্তিহীন আদেশও রয়েছে, সেগুলিও শিশুর অধিশাস্তার অংশ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে বড় হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় শিশু আরো বহুমুখী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এবং তার অধিসাস্তায় অনেক গ্রহণ - বর্জন চলতে থকে, কিন্তু অধিশাস্তার একটি অতি প্রাচীন অংশ অপরিবর্তিতই থেকে যায় এবং মনের গভীরে কাজ করতে থাকে। অধিশাস্তার অনুশাসন না মানলে মনের অপরাধবোধ জাগে এবং আমাদের মনে শাস্তির ভয় আসে (fear of punishment)। এই শাস্তির ভয় অনেক সময় ক্ষতির আশঙ্কার রূপে আমাদের মনে আসে। বহু ক্ষেত্রে, অপরাধবোধটি চেতন স্তরে বা সংজ্ঞান মনে থাকে না, কিন্তু ক্ষতির আশঙ্কা মনে সুস্পষ্ট ভাবে কাজ করতে থাকে। আবেশিক বায়ুর রোগীরা সব সময়ই বলে যে তারা অমুক - অমুক কাজ না করলে কিছু একটা ক্ষতি হয়ে যাবে। আমাদের নির্জ্ঞান মনের চিন্তাধারায় আমরা ক্ষতিকে শাস্তিরূপে ধরি। যেমন আমরা প্রয়শঃই বলি, 'আমি কী এমন অন্যায় করেছি যে আমার ক্যান্সার হল' অথবা 'আমি তো কখনো কারো কোনো ক্ষতি করিনি, আমার এমন হল কেন?'

অধিশাস্তার কঠোরতা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন-ভিন্ন। কারো অধিশাস্তা অত্যন্ত কঠোর — সামান্য বিচ্যুতিতেই শাস্তির আশঙ্কা মনে জাগে। যাঁরা Obsessive compulsive Disorder -এ ভোগেন— তাঁদের অধিশাস্তা অত্যন্ত কঠোর। সামান্য বিচ্যুতিতেই তাঁরা নিজেদের অপরাধী বলে মনে করেন। কারো অধিশাস্তা আবার অত্যধিক শিথিল। এঁরা বড় - বড় নৈতিক বিচ্যুতিতেও বিচলিত হন না। Psychopathic personality -র ব্যক্তিদের কোনো অজানা কারণে নৈতিক বোধের সৃষ্টিই হয় না। তাই তারা নির্দ্বিধায় খুন, হত্যা, ধর্ষন ইত্যাদি করতে পারেন।

গঠনমূলক তত্ত্বের মাধ্যমে ফ্রয়েড মানসিক যন্ত্রের গঠন ও ক্রিয়াবলী এবং সংজ্ঞান, আসংজ্ঞান ও নির্জ্ঞান মনের উপাদানকে একসূত্রে গ্রথিত করে মানসিক ক্রিয়া ও চেতনার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে এক সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে একটা কথা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। সত্যি সত্যি মনে যে এরকম তিনটি বিভাগ আছে এবং অসদ, অহম ও অধিশাস্তা নামক তিনটি entity আছে, তা নয়। অদস, অহম ও অধিশাস্তা তাত্ত্বিক entity মাত্র। এগুলি বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়াগুচ্ছের (group of functions) একত্রিত নাম। বাস্তবের সঙ্গে উপযোজন না হলে প্রাণীর অস্তিত্ব - সঙ্কট উপস্থিত হয়। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বহির্জগত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে, স্মৃতি, বুদ্ধি ও চেষ্টীয় পেশী সমূহের সাহায্যে অহম নিজের চাহিদা পূর্ণ করার কাজ করে। অদস আমাদের প্রবৃত্তিগত চাহিদার প্রতিনিধিত্ব করে আর বাস্তব পরিস্থিতি অনুকল হলেই আমরা সব চাহিদা মেটাই তা নয়। আমার চাহিদা পূরণ আমার নৈতিক মানদণ্ডের নিরিখেও গ্রহণযোগ্য হতে হবে। এই কাজ করে আমাদের অধিশাস্তা — কিছুটা সংজ্ঞান স্তরে আর কিছুটা নির্জ্ঞান স্তরে। সংজ্ঞান, আসংজ্ঞান বা নির্জ্ঞান নাম সত্যি স্তরবিভাগ মনে নেই। এগুলি চেতনার নিরিখে বিভিন্ন মানসিক উপাদানের গুণ নির্দেশ করছে।

এত আলোচনার পর আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, এই বিশাল তত্ত্ব আমাদের কী কাজে লাগবে। কোন দিক দিয়ে আমরা লাভবান হব? প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করা যাক।

প্রথমতঃ, মনঃসমীক্ষণ শুধুমাত্র পুঁথিগত তত্ত্ব নয়। পূর্বেই বলেছি, মনঃসমীক্ষণের প্রতিটি প্রকল্প (hypothesis) মানসিক রোগীদের নিকট থেকে পাওয়া উপাত্তের (data) উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং যে আলোচনা আমরা উপরে করেছি, তা শুধুমাত্র তাত্ত্বিক আলোচনা নয়। কী ভাবে মানসিক রোগ লক্ষণ তৈরি হয়, উপরের আলোচনা আমাদের সেটাই তাত্ত্বিক ভাবে ব্যাখ্যা করে দেখাচ্ছে। মনঃসমীক্ষণের মতে যেহেতু মানসিক সুস্থতা ও অসুস্থতার মধ্যে কেবলমাত্র পরিমাণগত (quantitative) পার্থক্য আছে, গুণগত (qualitative) কোনো পার্থক্য নেই, তাই এই তত্ত্ব আমাদের স্বাভাবিক ও সুস্থ মানব - মনকে বুঝতেও অনেক সাহায্য করে। মনঃসমীক্ষণের মতে আমাদের জীবনে

চেতন বা সংজ্ঞান মনের তুলনায় নির্জ্ঞান মনের ভূমিকা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যেমন career choice, বিবাহের সঙ্গী নির্বাচন, আমাদের বিবাহিত জীবনের ধারা ও গতি-প্রকৃতি ইত্যাদি সবই নির্জ্ঞান মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমি অনেক সময় জানিও না কেন আমি বিশেষ এক মানুষকে জীবনসঙ্গীরূপে নির্বাচিত করলাম। সচেতনভাবে আমি যা জানি, অনেক সময় দেখা যায় প্রকৃত কারণ তা নয়। অনেক সময় এই প্রকৃত কারণ না জানায় বিবাহিত জীবনে জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। মনঃসমীক্ষণের মাধ্যমে ঐ প্রকৃত কারণটি সম্বন্ধে সচেতন হলে, আমাদের ব্যবহারে পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়।

একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছি। এক মধ্যবয়সী মহিলা গলায় ক্যান্সারের আবেশিক ভয় (obsesive fear)-এর জন্য চিকিৎসায় এলেন। মনঃসমীক্ষণের ফলে ধীরে ধীরে জানা গেল, ভদ্রমহিলা তাঁর মামা বাড়িতে বড় হয়েছেন। চাকরি সূত্রে বাবা-মাকে বিভিন্ন জায়গায় বদলি হতে হতো, তাই পড়া-শোনার সুবিধের জন্য তাঁকে দিদিমার কাছে রাখা হয়েছিল। মামা বাড়িতে তিনি যথেষ্ট আদর-যত্নে বড় হয়ে ছিলেন কিন্তু মায়ের সঙ্গে বারবার এক দূরত্ব এবং মামা বাড়িতে পাঠিয়ে দেবার জন্য মায়ের প্রতি রাগ তাঁর মনে থেকেই গিয়েছিল। যথা সময়ে বিবাহের পর স্বামীর কাছে ভালোবাসা ও সহযোগিতা পেলেও শ্বাশুড়ি অকথ্য অত্যাচার করেছিলেন। বিবাহর কিছু দিন পরেই পিতৃপ্রতিম মামা গলায় ক্যান্সার হয়ে মারা যান। এর কিছু দিন পর থেকে মহিলার নিজের আবেশিক বায়ু শুরু হয়ে যায়।

মনঃসমীক্ষণের ফলে আমরা জানতে পারলাম তাঁর মনে অনেক অবদমিত ক্রোধ জন্মে রয়েছে— মায়ের উপর রাগ, শ্বাশুড়ির উপর রাগ। কঠোর অধিশাস্তা তাঁকে কারো উপর রাগ কখনো প্রকাশ করতে দিত না। এই রাগ বা আক্রমবৃত্তি যখন প্রবল আকার ধারণ করলো তখন প্রথমে তিনি উৎকণ্ঠা বোধ করলেন। অহম আক্রমবৃত্তিকে অবদমন করল কিন্তু মহিলাটির অধিশাস্তা তাঁকে ক্ষমা করলো না। প্রবল ধ্বাংসাত্মক ও আক্রমণাত্মক বৃত্তির জন্য তাঁর মনে শাস্তির ভয় দেখা দিল। এই শাস্তি হল, তিনিও গলায় ক্যান্সার হয়ে মারা যাবেন। পিতৃপ্রতিম মামার ক্যান্সারে মৃত্যু তাঁকে ক্যান্সার রোগ নির্বাচনে সাহায্য করল।

এখানে আমরা আক্রমবৃত্তির সঙ্গে অহম ও অধিশাস্তার দ্বন্দ্ব (conflict) দেখতে পাচ্ছি। অহম আক্রবৃত্তি (aggression) নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য তাকে অবদমিত করল, কিন্তু অধিশাস্তার মানদণ্ড যা তিনি শৈশবেই অন্তঃক্ষেপন করেছিলেন, সেখান থেকে তাঁর অপরাধ বোধ ও শাস্তির ভয় উঠে এল। অপরাধ বোধ ও আক্রমবৃত্তি দুই-ই নির্জ্ঞান স্তরে ছিল, শুধু শাস্তির ভয়, চেতন বা সংজ্ঞান স্তরে উঠে এসেছিল। তাই, তিনি শুধু ভয়টি অনুভব করেছিলেন, কারণটি তাঁর অজ্ঞাত ছিল।

ফ্রয়েড ও পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্যরা এবং অন্য অনেক মনঃসমীক্ষকরা মনোবিজ্ঞানের এই বিশেষ শাখাটি গড়ে তুলেছেন যা স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক দু'ধরনের মানসিক ক্রিয়াবলীর ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করে। মনঃসমীক্ষণ শুধু মানসিক রোগ বা মানুষের সাধারণ ক্রিয়ার ব্যাখ্যা দানেই নিজেকে সীমিত রাখে নি। আমাদের বহুলাংশে আমাদের নির্জ্ঞান মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই আজ মনঃসমীক্ষণী সমালোচনা সাহিত্য পঠন - পাঠনেরও একটি বিশিষ্ট শাখা। নৃতাত্ত্বিকরা অনেক সময় (authropologist) বিভিন্ন জনজীবন ও গোষ্ঠী জীবনের রীতি -নীতি ব্যাখ্যায় মনঃসমীক্ষণের তত্ত্ব প্রয়োগ করেছেন। সুতরাং মানব মনের সামগ্রিক ও বিচিত্র বহুমুখী প্রকাশ বুঝবার ক্ষেত্রে নির্জ্ঞান মন সম্পর্কিত এই তত্ত্ব আমাদের সামনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে দিয়েছে।